Vol. 39 | No. 3 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৪৭-১৯৭১)

Volume	39
Issue	3
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ইসরাইল খান
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i3.6
Pages	179-210
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র

(১৯৪৭ — ৭১)

ইসরাইল খান

এক

প্রস্তাবনা :

সমাজ-সংস্কৃতি ভাষা-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মনন ও চিন্তাধারার বিকাশে সাহিত্যপত্র বা সাময়িকী-সংকলনের অপরিসীম গুরুত্ব আধুনিক কালে সর্বজন-স্বীকৃত। সাহিত্যের তো বটেই, ইতিহাসের আকর-উৎসরূপেও পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান এখন একটি স্বীকৃত পদ্ধতিরূপেই প্রতিষ্ঠিত। বৈরী-পরিস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলের পত্র-পত্রিকায় বাঙালির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচন করে,— এমন অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বলা আবশ্যক যে, পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে তাৎপর্যপূর্ণসংখ্যক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ লাভ করে। অবশ্য এর বেশিরভাগ পত্রিকাই তৎকালীন সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছত্রছায়ায় কিংবা অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হয়। এতে তাই প্রাধান্য পেয়েছে পাকিস্তানের শাসন-শোষণ দীর্ঘতর থাকতে-রাখতে সহায়ক হয়— এমন বক্তব্য বা মর্মজ্ঞাপক সাহিত্য ও সাহিত্যবাচক রচনারাজি। পাশাপাশি প্রতিকূলতার মধ্য-দিয়েও বাঙালির স্বার্থ-সংরক্ষণে সহায়তাকারী অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য ও জাতীয় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সকল কার্যক্রমকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মোকাবিলা করার দুঃসাহস দেখাতে চেয়েছিলো— এমন কিছু পত্রিকাও ১৯৪৭-৭১ পর্বে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের সম্পাদনা-প্রযোজনায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত পত্রপত্রিকার কৃতিত্ব নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রয়াস-প্রচেষ্টা এ-পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ করেছে। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়েছে। এসবের মূলে অবশ্যই কতিপয় পত্রপত্রিকা, আর লেখক বুদ্ধিজীবীর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোন্ শ্রেণীর পত্রিকা ? কারা সেই সব পত্রিকার লেখক, সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক কিংবা প্রযোজক ? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যেই আমি বিশ শতকের বাংলা সাময়িক-সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ব্রত গ্রহণ করি। বর্তমান প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে

প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে এ-কালের পূর্ববঙ্গের সাময়িক-সাহিত্য পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

দুই

১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব বাঙলার সাময়িকসাহিত্য পরিস্থিতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রপত্রিকার পরিচয়

ক

১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী কালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী ছিলো কলকাতা। আধুনিক কালে বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাতও হয় কলকাতায়। অতএব প্রধান-প্রধান সাহিত্যপত্রিকা কলকাতা থেকেই প্রকাশ পায়। ঢাকা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিলা-শহর। অন্যান্য জিলা শহরও তখন মোটামুটি গুরুত্ব বহন করতো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রধান পত্রিকাগুলোর অনুকরণে বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকেও নানা জাতের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতো। অনুসন্ধানে তাই দেখা যায় ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট প্রভৃতি জিলা বা আঞ্চলিক শহর-এলাকা থেকেও (পশ্চিম বাংলার মফস্বল শহরগুলোর কথাও স্মর্তব্য) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র, সাময়িকী ও সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগ-উত্তর কালে ঐ সকল পত্রিকার কোনো-কোনোটার প্রকাশ অব্যাহত ছিলো। তবে নতুন রাষ্ট্রে অনেক নতুন পত্রিকাও ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মফস্বল-শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) সম্পাদিত 'তকবীর' (পাক্ষিক, ১৯৪৭); দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-) সম্পাদিত 'নওবেলাল' (সাপ্তাহিক, ১৯৪৭) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে বগুড়া ও সিলেট থেকে। 'ঢাকা প্রকাশ' ১৮৬১ সনে এবং 'ঢাকা বার্তা প্রকাশিকা' (সাপ্তাহিক) ১৮৬২ সনে ঢাকা থেকে; আর 'অমৃত প্রবাহিনী' (পাক্ষিক) যশোর থেকে ১৮৬২ সনে প্রকাশিত হতো। মোট কথা, কলকাতায় রাজধানী থাকা অবস্থায় বাংলা সাময়িকপত্র বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উনিশ শতকের বিভিন্ন পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃতবাজার', 'আজাদ' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা-র আঞ্চলিক অফিস এবং ম্যানেজারিয়েল-ব্যবস্থা ঢাকাতে বলবৎ ছিলো। 'তোষিনী' (১৩১৭); 'আইনুল ইসলাম' (১৯২৩); 'বাসন্তিকা' (১৯২২ থেকে এখনও চালু); 'শতদল' (১৯২২ থেকে); 'প্রাচী' (১৩৩০); 'তরুণপত্র' (১৯২৫); 'দরদী' (১৯২৬-৪৯); 'অভিযান' (১৯২৬); 'সবুজপল্লী' (১৯২৬); 'প্রগতি' (১৯২৭-৩০); 'শিখা' (১৯২৭-৩১); 'জাগরণ' (১৯২৮); 'সঞ্চয়' (১৯২৮);

'চাবুক' (১৯৩৩-৪৯); 'জিন্দেগী' (১৯৪৭); 'রাজভোগ' 'বঙ্গবন্ধু' প্রভৃতি পাক্ষিক-মাসিক সংবাদ-সাময়িকী ও সাহিত্যপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাতচল্লিশ সনের স্বাধীনতালাভের অনেক আগে থেকেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সনে নুরুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী' প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরের 'নওরোজ' (১৯৪২-৭১) এবং ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহর থেকে নানা জাতের সাময়িকপত্র অব্যাহতভাবে প্রকাশের তথ্য পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্রের ঐতিহ্য প্রদর্শন করছে। অতএব একথা সত্য, পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য দীর্ঘ। কিন্তু উন্নতমানের মুদ্রণব্যবস্থার-অভাব ছিলো। বড়ো প্রেস ও মুদ্রণশিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিলো না এ-অঞ্চলে। প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছা থাকলেও তাই উপায় ছিলোনা। 'চাবুক', 'ঢাকাপ্রকাশ' 'দরদী' প্রভৃতি প্রচলিত পত্রপত্রিকা ১৯৪৭ সনেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এগুলো তাই পাকিস্তান যুগের উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িকপত্র— যা ঢাকা থেকে পূর্বে প্রকাশিত হয় এবং পাকিস্তান আমলেও ভূমিকা পালন করে। 'চাবুক' 'পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক' পত্রিকা ছিলো। বিভাগ-পরবর্তীকালে সম্পাদক হিন্দু ছিলেন বলে ভারতে চলে যান— অনুমান করলে পত্রিকা বন্ধের কারণ পাওয়া যায়।

কলকাতা থেকে ঢাকা এসে 'কাফেলা' মাসিকরূপে ১৯৪৭ সনে আত্মপ্রকাশ করে। আবদুল গণি হাজারী 'পিপলস পার্টির সাপ্তাহিক রাজনৈতিক মুখপত্র 'আলোড়ন' ১৯৪৭ সনে সম্পাদনা করেন। 'আজাদ পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুখপত্র' ফয়েজউদ্দীন হোসেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ফরিয়াদ'; এবং 'ছাত্রলীগ' শীর্ষক রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকাও ১৯৪৭ সনেই প্রকাশিত হয়। 'ছাত্রলীগ' সম্পাদনা করেন কাজী আবদুল মান্নান ও একরামুল হক। অতএব একালের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি ও সমাজসংস্কৃতির রূপান্তর, পরিবর্তন ও নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে।

১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয় 'পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র'—'তাওহীদ' (১৯৪৮); 'তকবীর' (১৯৪৮); এবং 'নবনূর' (ফেনী: 'ইসলামী সাম্য ও সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তান গড়িয়া তোলার পথে সাহায্য করার জন্য— অর্ধসাপ্তাহিক'; সম্পাদক: মহিউদ্দিন আহমেদ)। এই সময়ে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক শাহেদ আলী ও এনামুল হক সম্পাদিত এবং মোহাম্মদ আবুল কাসেম প্রকাশিত ঢাকার 'সাপ্তাহিক সৈনিক' (১৯৪৮)। এরপর 'যুগের দাবী'; 'নিশান' ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয়।

'রেনেসাঁ', 'সুলতানা', 'তানজীম'; 'জনমত', 'পাকিস্তান', 'দীপালী' (১৯৪৯), 'খেদমত', 'কোহিনূর', 'তওফিক' (১৯৫০), 'পাকহিতৈষী', 'পাক-সমাচার', 'পঞ্চায়েৎ' (১৯৫১), 'আলোর পথে' (১৯৫২), এবং 'চিত্রালী' (১৯৫৩), 'জমানা' (১৯৫৪), 'জনমত' (১৯৫৫) এবং 'প্রবাহ' (১৯৫৬; প্রধান সম্পাদক আহসান হাবীব; সম্পাদক: জহীর রায়হান। এতে সাহিত্য তথা গল্প, কবিতা প্রভৃতিও থাকতো) পূর্ববাংলার প্রখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ। একালেই 'পূর্বদেশ' (১৯৫৬) প্রভৃতি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সন পর্যন্ত ১২৮টি সাপ্তাহিকী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি জিলা এবং মহকুমা ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গ্রুপ ও শ্রেণীর মুখপত্র-রূপে প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯৪৭-৭১ পর্বে ২০১টি মাসিক, ১২৮ টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক ও ২৭ টি দৈনিক, ২৭টি ত্রৈমাসিক, ১৪টি দ্বিমাসিক, ১০টি ষান্মাসিক, ৭টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, অনেক সংকলন, ২১শের বিশেষ সংখ্যা, গোটা দশেক বার্ষিকী, কিছু চতুর্মাসিক, ১৭টি মহিলা পত্রিকা, ৩৩টি কিশোর পত্রিকা ১৮টি বিজ্ঞান-বিষয়ক এবং ১১টি ধর্মবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলে শামসুল হকের 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১৯৪৭-৭১) শীর্ষক গ্রন্থে (১৯৭৩, ঢাকা) জানা যায়। তিনি ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "এ-গ্রন্থে ৫০০ খানি পত্রিকার আলোচনা আছে। যেসব পত্রিকা একই নামে সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে, পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক বা মাসিক থেকে পাক্ষিকে পরিবর্তিত হয়েছে— এ জাতীয় পত্রিকাকে পৃথক পৃথক ধরে এ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।"

অর্থাৎ একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে অনেক পত্রিকা। তবুও গণনায় ১৯৪৭-৭১ সময়কালে প্রকাশিত সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দফতরের, বিদেশী দূতাবাসের বিভিন্ন মুখপত্রের এবং প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট থেকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র অন্তর্ভুক্ত করার পরও মাত্র ৪৭৬টি পত্রিকার নাম শামসুল হকের উপরিউক্ত বইয়ে পাওয়া যায়। তিনি এই তালিকা প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন আলোচনা এবং মৌখিক সংবাদ-তথ্যের (কিংবা বিবরণ-এর) ব্যবহার করে তালিকা দীর্ঘ করেছেন। সমস্ত পত্রিকা সংরক্ষিত নেই কোনো গ্রন্থাগারে। আবার কোনো পত্রিকা থাকলেও সকল সংখ্যা পাওয়া যায়নি। মাহেনও, মোহাম্মদী, আল-ইসলাহ্, সওগাত, দিলরুবা, নওবাহার এবং সমকালের মতো উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর উদাহরণ বা ব্যতিক্রম এ-ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। শামসুল হকের গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত পত্রিকার নামও আছে। তালিকা দীর্ঘ হবার সেটাও একটা কারণ বটে। কিন্তু বিবরণ ও ক্রমিক সংখ্যা লম্বা হলেও উন্নতমানের পত্রিকা পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষায় খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। যদিও বাংলাদেশ আমলের পঁচিশ বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাংলা সাময়িকপত্র

(বিশেষত মুসলিম জনঅধ্যুষিত পূর্ববাংলা থেকে, মুসলিম সম্পাদক-প্রকাশকদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকার প্রেক্ষিতে বিবেচ্য) ঔপনিবেশিক আমলেই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে যেন বাংলা সাময়িকপত্রের অবক্ষয়ের কাল আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য জগতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মাসিক-দ্বিমাসিক-ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিন্দুদের দ্বারা যে উদ্দীপনা নিয়ে প্রকাশিত হতো— ১৯৪৭ সনের পর সেখানেও স্থিমিতাবস্থা বিরাজ করছে। আর তাই প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, মর্মবাণী, বিচিত্রা, 'শনিবারের চিঠি'র মতো নিয়মিত পাঠের আগ্রহ-কৌতূহল সৃষ্টিকারী মাসিক পত্রিকা আর বের হয়নি। সবুজপত্র (১৯১৪), 'কল্লোল' (১৯২৩), 'পরিচয়' (১৯৩১), 'কবিতা' (১৯৩৫), 'চতুরঙ্গ'র (১৯৩৮), ন্যায় 'মাইলফলক' হিসেবে গণ্য হবার মতো পত্রিকার কথা না-হয় না-ই ধরলাম। পূর্ববাংলায়ও 'সমকাল', 'কণ্ঠস্বর' প্রভৃতি মাসে-মাসে (অনিয়মের অভিযোগ মনে রেখেও) প্রকাশিত হয়— এমন অন্তত সাতটি পত্রিকা ৭১পূর্বকালে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো। কিন্তু প্রতিমাসে নিয়মিত বের হয়— এমন একটি সৃজনশীল সাহিত্যপত্রিকাও, বিগত ২৫ বছরে প্রকাশিত হয়নি। কেবল ব্যতিক্রম আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত সৃজনপ্রয়াসী মাসিক 'লোকায়ত (১৯৮২—) পত্রিকাটি। এটি প্রথম বছরে নিয়মিত বের হয়। তাও ১২ টির স্থলে ১১টি (৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা যুগ্ম প্রকাশিত হয় বলে) প্রকাশিত হয়। পরের বছর থেকেই অনিয়মিত হতে থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর থেকে ৩/৪/৫ টি করে বের হয়েছে। মাঝে মাঝে এক-দুই বছর একদম বন্ধ থেকেছে। মুস্তাফা নূরউল ইস্‌লাম (১৯২৭-) এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-) সম্পাদিত 'সুন্দরম' ও 'সাহিত্যপত্র' ত্রৈমাসিক হিসেবেই প্রকাশিত হয়। অতএব মাসিক পত্রিকার দিন অন্তগত বলা চলে। বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সচিত্র বিনোদনমূলক এবং, কিংবা রাজনৈতিক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা। পত্রিকা-জগতের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যযোগ্য।

পাকিস্তান আমলের পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রধানগুলোর অধিকাংশই রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর অপ্রধানগুলোর বেশীরভাগই প্রকাশিত হয় মফস্বল শহর থেকে। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা— 'পূর্বমেঘ' (১৩৬৭) ও 'উত্তর-অন্বেষা' (১৩৭৪)। সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'আল-ইসলাহ্' (১৯৩২-৮৫); আর চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' (১৯৪৭-৫২) ইত্যাদি। জিলা, মহকুমা, থানা পর্যায় থেকেও প্রকাশিত হয়েছে অনেক পত্রিকা। রাজধানী থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা 'মাহেনও' (১৯৪৯-৭১); 'দিলরুবা' (১৯৪৯-৬৪); সওগাত (১৯৫২-৭১); 'সমকাল' (১৯৫৭-৭১) এখনই দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে। মফস্বলের সাময়িকীগুলোর তো কোনো কথাই নেই। অধিকাংশ

পত্রিকারই দু'চার-পাঁচ সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে। বহু পত্রিকার কেবল নামই শোনা যায়। কিছুই জানা যায় না, এমন অনেক পত্রিকাও আছে। কিন্তু তারপরও শ'পাঁচেক পত্রিকা পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো বলে অনুমান করা যায়। উন্নতমানের কোনো সাহিত্যপত্রিকা এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারে নি। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী প্রতিবন্ধকতা তখনও ছিলো প্রকট। বড় অভাব ছিলো ভাল লেখার। 'বাংলাদেশের লেখক' সম্প্রদায় তখন কেবল গড়ে উঠছেন। অথচ হঠাৎ করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। এ-অবস্থায় নব্য-শিক্ষিত, 'হাতে-খড়ি' দেয়া লেখকদের রচনাতেই পূর্ণ থাকতো তাবৎ পত্রিকা। দু'চারজন সম্পাদক উন্নতমানের লেখক নির্বাচন করে ভালো লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ফলে পূর্ববঙ্গে খুব অল্পসংখ্যক পত্রিকাই মান নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। আবার সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দু-লেখক ও উচ্চ-আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারত-গমনের ফলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তা পূরণ করতে গিয়েও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান বাঙালি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু মান বজায় রাখতে পারেন নি। তা অর্জন করতে সময় ক্ষেপণ করতে হয় অনেক। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ভালো না-থাকায় পূর্ব বাংলার সাহিত্যসমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমান লেখকেরা শিকড় গাড়তে বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করতে পারেন নি। হাতে গোনা দু'চারজন লেখক মাত্র সেখানে গত পঞ্চাশ বছরে আবির্ভূত হয়েছেন। বলতে গেলে, মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চার কোনো প্লাটফর্মই তৈরি হয়নি সেখানে। একটি ভালো দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক এমনকি মাসিক পত্রিকাও নেই তাঁদের। ('চতুরঙ্গ' মুসলমান প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত হলেও, বর্তমান মালিকানা মুসলমানদের হাতে নেই, আতাউর রহমানের স্ত্রী নীরা রহমান শেয়ার হোল্ডার হলেও, কর্তৃত্ব মুসলমানদের নয়।) পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ বা লেখক-সম্প্রদায় এবং গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ রাজধানী কলকাতাতেই থেকে যাবার ফলে (হিন্দুরা বেশি, মুসলিম কতিপয়) বাঙলার মেধাবী তাবৎ লেখক কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতে।

খ

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতিমালার আওতায় বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠলো। সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির বাস্তবতা যখন অস্বীকৃত হলো, তখন—, সেই সংকটময় শূন্যতার কালে, পূর্ববাঙলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো সুস্থ মানবিক চিন্তা-চেতনাভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্যচর্চার উপযুক্ত

উন্মুক্ত পরিবেশ। সেজন্য দরকার ছিলো ভালো সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের। আর সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয়-অঙ্কনের বিভিন্ন ধারার গতিশীল সংস্কৃতি-চর্চার অফুরন্ত অবকাশ থাকা দরকার হলেও, সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও সাবধানতা এমন পর্যায়ে ছিলো যে, বাঙালি-সংস্কৃতির ও গণ-সংস্কৃতির চর্চা গণ্য হতো রীতিমতো 'কমিউনিস্ট'-কার্যাবলী হিসেবে। আর 'ভারতীয় দালাল' এবং 'পাকিস্তানের শত্রু', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছাড়া বাঙলা-সংস্কৃতির চর্চা-যে কেউ করতে পারেন, তা ছিলো তখন সরকারি বিবেচনায় অসম্ভব ও অভাবনীয়। সরকার-সমর্থক, সাম্প্রদায়িক, উগ্র পাকিস্তানবাদী কবি-সাহিত্যিকেরাও ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো জাতীয়-স্বার্থের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে তখন (এখনকার মতোই) চরম শত্রুতা ও মুনাফেকী করতে লেগে গেলেন। এমনি এক বন্ধ্যা, সৃষ্টি-বিরোধী সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিস্থিতিতে উত্তরকালের (১৯৭১) স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তি-সহায়ক সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উনিশ শ সাতচল্লিশ সন থেকেই কাজ শুরু করেছিলেন একদল কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মী। দেশের কোনো-কোনো অঞ্চলে এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক-কর্মী সরকারী আদর্শের, সাম্প্রদায়িক চিন্তার, হীন উদ্দেশ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের, এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নানান নামের সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা কলম ধরেছিলেন প্রগতিশীল মানবতাবাদী নীতি অবলম্বন করে এবং বাংলা ভাষার সুস্থ বিকাশের ও বাঙালী-সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে।

এ-ধারাতে প্রথমেই প্রকাশিত হলো— ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জ থেকে কার্তিক ১৩৫৪, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৭ সনে 'কৃষ্টি' নামের একটি মাসিক পত্রিকা। উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। সম্পাদনা-পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। আর পাকিস্তানী মুসলমানদের ইসলামী প্রজাতন্ত্রে, একধর্ম-জাতির রাষ্ট্রে ভিন্নমতাবলম্বীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সত্য উচ্চারণে অনেক বাঁধা ছিলো। রাষ্ট্রটি গঠিতই যেখানে মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সেখানে যুক্তিবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রমণের শিকার হবেই। কাজেই 'কৃষ্টি' বেশি দিন প্রকাশিত হতে পারে নি। কালের দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর কৃষ্টির মাত্র একটি সংখ্যা পাওয়া গেলেও একাধিক সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিলো— তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

'কৃষ্টি' প্রকাশের কালেই (কার্তিক ১৩৫৪) 'সীমান্ত' প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুবউল আলম চৌধুরী (১৯৩০-) ও সুচরিত চৌধুরীর (১৯৩০-৯৪) যুগ্ম-সম্পাদনায়। সম্পাদক-প্রযোজক-উদ্যোক্তাদের ঘিরে মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে-আদর্শ, বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অখণ্ড

অবিভাজ্য ঐতিহ্যের অনুরাগী, সর্বোপরি দাঙ্গা-বিরোধী সম্প্রীতির মনোভাব-পুষ্ট যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে লাগলো— তা কালে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করলো। 'সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মী সমমনাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' অনুষ্ঠিত করলো পূর্ব বাংলার প্রথম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫১ সনের মার্চ (১৬-১৯ মার্চ ১৯৫১) মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে। এই সম্মেলনের সাফল্য ও আনন্দ উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামী সংস্কৃতিকর্মীদেরকে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায়, ১৯৫৪ সনে ঢাকায় এবং ১৯৫৭-এ কাগমারিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সম্মেলন করতে।

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ঢাকা থেকে ত্বরিৎ প্রকাশিত হলো অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা 'সংকেত' (১৯৪৮; পৌষ ১৩৫৫; সম্পাদক সিরাজুর রহমান)। এঁরা দাবি করেছিলেন— 'সংকেত'— 'পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল মাসিক' পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়— "যাত্রাপথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান— সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো— দেশভাগের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবন ও মনকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।"

এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকাটিকে অকালমৃত্যু এসে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সংখ্যার পর, 'সংকেত' আর প্রকাশিত হয় বলে জানা যায় না।

অত:পর ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫) প্রতিষ্ঠিত 'অগত্যা' (১৯৪৯) প্রকাশিত হলো। একদল তরুণ ছিলেন লোহানীর সহযাত্রী। ফলে তিন চার বছর পত্রিকাটি অগ্রসর হতে পেরেছিলো। বিপুল জনপ্রিয়তাও তাঁদের জোটে। অবশ্য প্রধান, প্রতিষ্ঠিতদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্যেই তাঁদের আলোচিত হবার প্রধান কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়। আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-৭৬) এবং মাহবুব জামাল জাহেদী (১৯২৩) প্রকাশিত একটি ভালো সাহিত্যপত্র 'মুকতি' (১৯৫০) প্রকাশিত হয়ে মাত্র তিন-চার সংখ্যার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' (১৯৫১-৫৩) মফিজউল হকের সম্পাদনায় দুই-তিন বছর চলে উঠে যায়। প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মী ও চিন্তাবিদ, একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-৭১) ও আহমদ কবির সম্পাদিত 'যাত্রিক' (১৯৫৩)-এর ভাগ্যও মুকতির অনুরূপ হয়েছিলো। ঢাকা থেকে মহিউদ্দীন আহমদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত 'স্পন্দন' একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যপত্র ছিলো। কিন্তু তাও দুই তিন বছর মাত্র অনিয়মিত চলতে পেরেছিলো।

মেধাবী সাহিত্যকর্মী, সংস্কৃতি-সেবক ডক্টর এনামুল হক (১৯৩৭-) তরুণ বয়সে আইউব খানের সামরিক শাসনামলে 'উত্তরণ' (১৯৫৮) প্রকাশ করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চারুকলার ব্যাকরণ সম্মত বিচিত্র চিত্র শোভিত সাহিত্যপত্র 'উত্তরণ' তৃতীয় বর্ষের পর আর চলতে পারে নি। 'নাগরিক' ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত হয়ে বেশ ক বছর চলে। আর ঐ বছরেই ক্ষীণকায় পত্রিকা 'পলিমাটি' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭১ সন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা এসব পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। বন্ধ্যা, অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতের প্রয়াসী এইসব সাহিত্যপত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল, সরকারী ছত্রছায়া বা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী পত্র পত্রিকার একটি সংখ্যার সমান আকৃতি-ওজনের হলেও এগুলোর মধ্যেই নবযুগের অভিপ্সা অভিব্যক্তি লাভ করেছিলো। বাঙালির চিত্ত তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত হতে চলেছে।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার চেষ্টা-প্রয়াস বা ষড়যন্ত্র আগাগোড়াই করা হয়েছে। তাঁরা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করেছিলেন প্রচারমাধ্যমের অপরিসীম গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। তাই পাকিস্তানপন্থী ইসলামী পুনর্জাগরণ-বাদী অথবা ধর্মীয় আদর্শের প্রচারপত্ররূপে এক ঝাঁক শক্তিশালী সাহিত্যপত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, যেগুলো প্রগতিকে রোধ করার জন্য কোমর বেঁধেছিলো।

উপর্যুক্ত শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পাকিস্তানপূর্ব (১৯৩২) কালে প্রকাশিত 'আল-ইসলাহ্'র। ১৯৪৭ সনের পর এটি যথারীতি প্রকাশিত হয়। একদেড় বছর পর থেকে 'মাহেনও' (১৯৪৯-৭১); 'মোহাম্মদী' (নতুনভাবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ থেকে); 'দিলরুবা' (১৯৪৯-৬৪); 'নওবাহার' (১৯৪৯-৫৪) প্রভৃতি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পাকিস্তান সরকারের তথ্যকেন্দ্র প্রযোজিত 'মাহেনও' প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং পরে, অচিরেই ঢাকা থেকে (চৈত্র ১৩৫৫) প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 'মোহাম্মদী'ও (১৯২৭-) ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে তাঁদেরই কাঙ্ক্ষিত সাধের 'পাকিস্তান'কে নতুন-প্রাণ সঞ্চারের ব্রতে পুনরায় মাঠে নামেন। এঁদেরকে অনুসরণ করলো একগুচ্ছ সাহিত্যপত্র— 'দ্যুতি' (১৯৪৯-৫৩); 'তাহজিব' (১৯৫০); দিগন্ত (১৯৫৩-৬০); অতএব (১৯৬০-৬১); অভিযান (১৯৫৪-৬৪); পূরবী (১৯৬০); লেখক সংঘ পত্রিকা (১৯৬১); পরিক্রম (১৯৬২-৭০); সংলাপ (১৯৬১-৭০); উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭১) প্রভৃতি প্রধান ও অপরাপর অনুকরণশীল অপ্রধান একগুচ্ছ পত্রপত্রিকা।

বলা বাহুল্য, সরকারী খরচে এবং সরকারী কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা অনুপ্রেরণায় বিচিত্র শত-শত সাপ্তাহিকী, পাক্ষিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও সংকলন এই ধারাকে পুষ্টি জোগালেও শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানী আদর্শবাদীদের ভ্রান্তি বড়ো হয়ে ধরা পড়েছিলো। ক্রমে এক শ্রেণীর লেখক-সম্পাদক-পৃষ্ঠপোষক উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

তরুণদের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও এঁদের সাথে মানবতাবাদ, এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করলেন। ১৯৫২ সনের ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হবার ফলে এঁদের মানসে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী-চেতনার নির্যাস তৈরি করলো— তাকে পরিচায়িত করা যায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ভাবধারা' বলে। পাশাপাশি মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসীদের দলও ভারী হচ্ছিলো প্রধানত অনিয়মিত সংকলন, রাজনৈতিক পার্টির বুলেটিন ইত্যাদি অবলম্বন করে। কিন্তু এঁদের কোনো নিয়মিত, দীর্ঘায়ু, উন্নতমানের বিশালবপু পত্রিকা ছিলোনা, এখনও নেই। পাকিস্তানকালে কেবল নয়, পরবর্তীকালেও মার্কসীয় ধারার কোনো সাহিত্য পত্রিকা কল্লোল-প্রগতি-অগ্রগতি-পরিচয়-কবিতা-চতুরঙ্গের মতো খ্যাতি অর্জন করেনি। এই শ্রেণির লেখক-সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মতোই বুর্জোয়া কোনো দলের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে। যে-সমস্ত পত্রিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকেরা লিখেছেন সেগুলোই কালে প্রধান ধারা হয়েছিলো। কিন্তু ছয়-দফা পরবর্তীকালেই এঁদের চেতনায় পরিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে সকলের নয়, কারো-কারো মধ্যেই তা সৃষ্টিশীলতার রূপ নেয়। অধিকাংশের চিন্তাধারার সঙ্গেই পাকিস্তানবাদী ধারার পত্রিকার, লেখকগোষ্ঠীর সাযুজ্য, সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ছিলো। এক্ষেত্রে স্বার্থবোধ সমাজের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। বহু কবি সাহিত্যিক সম্পাদক শিল্পী সংস্কৃতিকর্মী পাকিস্তানের আদর্শকে উত্তম ভেবে ইসলামী ভাবধারার চিন্তাবিদদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সত্তর-একাত্তর পর্বেও। এ-অবস্থায় তরুণ সম্প্রদায় 'বন্দিবিবেক সমাজের' অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করলো 'শিখা-অনির্বাণ' এর মতো। মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা চলে, তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম পত্রিকা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪) প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সওগাত' (১৯১৮ তে প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয়পর্ব ১৯২৬, এবং ঢাকাই-পর্ব ১৯৫২ থেকে)।

পাকিস্তানকালের প্রধান পত্রিকারূপে যেটি নতুন করে খ্যাতি লাভ করে সেটা হচ্ছে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) সম্পাদিত 'সমকাল' (১৯৫৭-৭১)। এ-ধারায়ও কতিপয় বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয় পরপর। 'ইমরোজ' (১৯৫০-৫৪); 'সাহিত্য' (১৯৬০-৬৩); 'পূর্বমেঘ' (১৯৬০-৭০); 'পূবালী'

(১৯৬০-৭০); 'স্বদেশ' (১৯৬৩-৭০); 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৪-৭১); 'মেঘনা'(১৯৬৭-৭০) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করার মতো।

গ

এই কালে অনেক অপ্রধান পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এগুলোর বলিষ্ঠ কোনো মতাদর্শ ছিলো না। সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাকিস্তানবাদী ধারাকেই তাঁরা পরিপুষ্ট করেছেন। যেমন: দিনাজপুরের 'নওরোজ' (১৯৪২-৭১); 'জাগরী' (নারায়ণগঞ্জ. ১৯৫৬); 'দিগন্ত' (পশ্চিমপাকিস্তান : ১৯৫৪-৫৯); 'অতএব' (বগুড়া : ১৯৬০-৬১); 'অভিযান' (নাটোর : ১৯৫৪-৬৪) ইত্যাদি।

পশ্চিম-পাকিস্তানেও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিলো কর্মোপলক্ষে গমনকারী শিক্ষিত বাঙালিদের দ্বারা। 'দিগন্ত' প্রভৃতি পত্রিকা এবং বেশকিছু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে ওঠে। পূর্ববাংলার বাঙালি লেখকদের রচনাও তাতে প্রচুর ছাপা হতো। অর্থ ও যশের জন্য এঁরা তাতে লিখতেন প্রবাসী বাঙালি বন্ধুদের অনুরোধে। কিন্তু প্রবাসী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই পাকিস্তানবাদী ভাবধারার পরিপোষক ছিলেন। যদিও তাঁরা বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার চাইতেন।

'মৌলিক গণতন্ত্র' 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা' করে। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা থেকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্রস্বরূপ বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। "মৌলিক গণতন্ত্রের কার্য-প্রণালী, উন্নয়ন কার্য-পন্থা এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাগুলোতে মুখ্য হলেও সাহিত্য-শাখাও এ-পত্রিকাগুলোতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলো। নতুন লেখকদের রচনা-সম্ভার ছাড়াও কোনো-কোনো পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয়" ছাপা হতো। মফস্বল শহরের প্রতিশ্রুতিশীল লেখকেরা এসব পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন।

ঘ

মুসলিম-লীগের স্বৈরাচারী শাসনের যাতাকলে প্রগতিশীল তরুণদের উদ্যোগগুলো অবরুদ্ধ হওয়ায় এবং কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলিম সাহিত্যসমাজের পাকিস্তানবাদী প্রধান লেখকেরা বিভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে এসে স্বার্থের প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকায় সৃষ্টিশীলতা এক প্রকার স্তব্ধ হয়েই ছিলো। এ-সময়ে ১৯৫৪ পর্যন্ত সংবাদপত্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতে এক প্রকারের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছিলো। সাহিত্যজগতের অন্ধকার কাল একটা এটা। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে

জোয়ার আনা নানা কারণেই সম্ভব হচ্ছিলো না। কিন্তু ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন সাহিত্যের বিষয় ও চিন্তায় নতুনত্ব সৃষ্টির উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে দেয়। পাকিস্তানপন্থী, ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী অসৃষ্টিশীল ক্ষয়িষ্ণু ধারার প্রবীণদের এবং সরকারী আদর্শের প্রচারক 'মাহেনও', 'দিলরুবা', 'নওবাহার': ইত্যাদি-প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হলেও সৃষ্টিশীল তরুণদের সামনে পর্বত-প্রমাণ বাঁধা এসে দাঁড়িয়েছিলো। এঁদের অবরুদ্ধ সৃষ্টিপ্রয়াস মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনোত্তরকালে সওগাত-সমকাল-সাহিত্য-পূবালী-পূর্বমেঘ-পরিক্রমের মাধ্যমে কিছু-কিছু করে। মোহাম্মদী-মাহেনও–দিলরুবা প্রভৃতি দীর্ঘদিন চলেছে। সওগাত-সমকাল-পূবালী-পূর্বমেঘ-পরিক্রম প্রভৃতি পত্রিকা কিছুদিন যাবৎ (অন্তত: দশ বছর করে, পূবালী কেবল ৭ বছর চলে।) প্রকাশিত হলেও নিয়মিত স্বচ্ছন্দে বেরুতে পারে নি। বারে-বারেই গতি স্তিমিত হয়েছে। বছরের সবকটা সংখ্যা নিয়ম অনুযায়ী কোনো পত্রিকাই বের করতে পারে নি। নিয়মিত, দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দ্যে সমান মান-মর্যাদা নিয়ে পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হয়েছে প্রগতিশীল ধারার এমন একটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করার নেই।

তবে, একথা সত্য যে, স্বাধীনতা-লাভের (১৯৪৭) পর বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিলো নতুন রাষ্ট্রলাভের আনন্দ ও তা গড়ে তোলার প্রেরণা থেকে। সাতচল্লিশের আগে ঢাকায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য গড়ে উঠলেও বিচিত্র ধরনের পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য ছিলো না। নতুন দেশের রাষ্ট্রীয়-স্বার্থে নানা ধরনের পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা দেখা দিলো (যেমন: জেলা বা মহকুমা-প্রশাসকের, এবং সমবায়-আন্দোলনের মুখপত্র)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (যেমন: বাংলা একাডেমী, ইসলামিক একাডেমী বা নজরুল একাডেমী, কিংবা বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-এর গবেষণা-পত্রিকা (যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্যিকী, ভাষা সাহিত্যপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি) ছাড়াও 'প্রবীণহিতৈষী' প্রভৃতি নানান নামের ও জাতের পত্রিকা এবং নানা পেশাজীবীদের মুখপত্র প্রকাশের যে হিড়িক পড়ে যায়— তাতে নতুন নতুন সাহিত্যকর্মীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়। যাঁরা কোনো দিন 'সাহিত্য' পদবাচ্য কিছু যথা— গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটিকা, কথিকা, আলোচনা লিখবেন, এবং তা পত্রিকায় ছাপা হবে— এমন চিন্তাও করতে পারেননি, তাঁরাও ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ও রচনা প্রত্যক্ষ করলেন।

দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ফলে পূর্ববাংলায় লেখক-পাঠকদের লেখকবৃত্তির বা সাহিত্যচর্চার অভীপ্সার ব্যাপক মুক্তি সাধিত হলো। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের আপ্যায়ন-লাভের সুযোগ পেয়ে বাঙালি মুসলমান লেখকসমাজ

(বুদ্ধিজীবীগণ প্রধানত) পাকিস্তানবাদী হতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ 'পাকিস্তান' নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াতেই তাঁদের ভাগ্যে এই শিঁকে ছিঁড়েছিলো। ১৯৬০-৬৫ সন পর্যন্ত প্রায় সকলেই পাকিস্তানের স্থায়ীত্বে আস্থা রেখেই দেশের ও মানুষের কল্যাণের চিন্তা করতেন। সবাই তাই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'পাক্‌সার জমিন শাদবাদ' আন্তরিকভাবেই উচ্চারণ করতেন।

ঙ

বিভাগ-পূর্বকালে পূর্ববঙ্গ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। স্বাধীনতা দৈনিক পত্রিকার ধারাকেও মুক্তি দিলো। 'দৈনিক আজাদ' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর এদেশের সাময়িকপত্র জগতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জিন্দেগী' ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক সংবাদ' 'জিন্দেগী' কে আত্মীকরণপূর্বক ১৭ মে ১৯৫০-এ প্রকাশিত হলো। চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৭ সনে 'পূর্বপাকিস্তান' ও 'পয়গাম' নামে দুটি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এরপর দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয় আজকের খ্যাতনামা 'ইত্তেফাক'। তবে এটি প্রথমে শুরু হয়েছিলো সাপ্তাহিকরূপে। এ-ধারায় ইন্‌সান, মিল্লাত, আমার দেশ, জমানা, ইত্তেহাদ, বুনিয়াদ, চাষী, পূর্বদেশ, নাজাত, নবজাত, আজাদী, পয়গাম, স্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, আওয়াজ, জনমত, ইসলামাবাদ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে তখন চার-পাঁচটি দৈনিক পত্রিকা গুরুত্বের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর পাঠক-গ্রাহক সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, অবজারভার, মর্নিং নিউজ, টাইমস্, প্রভৃতি তখনকার নামকরা দৈনিক পত্রিকা। হামিদুল হক চৌধুরীর 'অবজারভার', ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (১৯৯১-১৯৬৯) ইত্তেফাক-গ্রুফ অব পাবলিকেশনস্ এবং সরকারী দৈনিক পাকিস্তান প্রভৃতি পত্রিকার জগতে প্রভাবশালী ছিলো। ১৯৭১ সনের শেষনাগাদ দৈনিক সংবাদপত্র ছিলো দশটির মতো। এগুলো ভারত বিভক্তির পর সাংবাদিকতা সংবাদপত্র ও সাহিত্য জগতের পুনর্গঠন কাজে ব্যাপৃত হওয়ায় এদেশে শিল্প-সাহিত্য বিকাশের পথ কিছুটা হলেও ত্বরান্বিত হয়।

চ

১৯৪৭-৭১ পর্বে শ পাঁচেক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলে শামসুল হক তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন— যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর বিষয় ও মেয়াদ-ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করলে দেখা যায় দৈনিক থেকে বার্ষিকী পর্যন্ত এবং বিষয়গত বিবেচনায় শিশু সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান কিংবা গবেষণার পত্রিকা সবই এসময়ে

প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক পরিস্থিতি সার্বিকভাবে অনুন্নত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘ হলেও সুদৃঢ় ছিলো না বলে পত্রিকা সংগ্রহের প্রবণতা দেখা যায় না। ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোগুলো পত্রিকা এখান থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছিলো তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের ধারা বুঝতে হলে নানাজাতের সংকলনগুলোর কথাও বলতে হয়। সরকারী অপকৌশলের প্রতিবাদে সবসময়ই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ ও তরুণদের ছোট ছোট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই সময়কালে তরুণদের উদ্যোগে বহু অনিয়মিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুআরিতেও প্রকাশিত হয়েছে বহু সংকলন। নতুন চিন্তাধারার পরিচয় বহনকারী এইসব সংকলনেই বিধৃত আছে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস।

এই কালের পাক্ষিক, মাসিক ও নানান সাময়িকীর সাহিত্যিক মান নিম্ন হলেও প্রচারের মাহাত্ম্যে এগুলোর প্রভাব নিতান্ত কম ছিলো না। এতে রম- সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টাও ছিলো। অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিকী ও নানাজাতের সংকলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে প্রকাশিত হবার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানী বাঙালি ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ লাভ করে। গুণে মানে উন্নত না-হলেও সবধরনের রচনা প্রকাশের সহজ-সুযোগ এসে পড়ায় সাহিত্য-সৃষ্টিতে গতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইলেও সচেতন-সজাগ বাঙালি ঠিকই 'মুক্তি-পাগল' হয়ে উঠেছিলো এবং স্বাধীনতালাভের প্রেরণা সঞ্চারিত করা হয়েছিলো এই কালের প্রগতিশীল ধারার নিয়মিত ও অনিয়মিত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। যদিও এর চতুষ্পার্শ্বে লোভের, মায়াজালের, ষড়যন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা আগাগোড়া জোরদারই ছিলো। ভারত-বিভক্তির সময়েও কূচক্রিরা সক্রিয় থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবকে কেটে জম্বু ও কাশ্মীর ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে দিয়েছিলেন। এদেশের লোকেরা প্রোপাগাণ্ডার শিকার হয়ে তখন তা নির্লিপ্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

ছ

বায়ান্নোর 'একুশে ফেব্রুআরি-আন্দোলন' বা রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম মুক্তিকামী জনসমাজকে উদ্দীপিত করেছিলো। ফলে ১৯৫৩ সনের ফ্রেব্রুআরি থেকে 'একুশের সংকলন' তথা 'শহীদ-দিবস সংখ্যা' নাম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য সংকলন প্রকাশের ঐতিহ্য যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনই ১৪ আগষ্ট, স্বাধীনতা, বা বিপ্লব-দিবস, সংখ্যাও প্রকাশের ধারা সূচিত হয়। ঈদসংখ্যা প্রকাশের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' ইত্যাদি তিরিশের দশক থেকেই ঈদসংখ্যা প্রকাশ করে

আসছিলো। এসবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-পন্থীরা বিরুদ্ধ সাংস্কৃতিক-চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন নানা পত্রিকা প্রকাশের (আর্থিক-অনুদান) সুযোগ দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে একুশের ধারাই। এজন্য বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে অনিয়মিত 'সাহিত্য সংকলন' ও 'একুশের সংকলন' গুলোর ভূমিকা বাঙালির সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিন

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শানুসারী কয়েকটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. মোহাম্মদী (দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৯-৭০)

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) প্রতিষ্ঠিত মাসিক মোহাম্মদী ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (কার্তিক ১৩৩৪) কলকাতা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মোহাম্মদী' মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কিছুদিন মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৭ সনে পুন:প্রকাশের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী দুর্ভিক্ষ-কবলিত সামাজিক অবস্থায়ও মোটামুটিভাবে ধারা বজায় রেখেই প্রকাশিত হয়েছিলো। একুশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো স্বাধীন পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে। একুশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে এবং ঐ সংখ্যায় বলা হয় যে, পরবর্তী সংখ্যা (অর্থাৎ ২১ বর্ষ ২ সংখ্যা) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় পতিত হবার পর দু'বছর আর আলোর মুখ দেখতে পায়নি। ২১ বর্ষ ২য় সংখ্যা ঢাকা থেকে বের হয় যখন, 'মাহেনও' ইত্যাদি বেশকিছু মাসিক পত্রিকা তখন নতুভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

মোহাম্মদীর সম্পাদনা বিভাগে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বাংলার মেধাবী লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। 'আজাদ' বের হবার আগে আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'মোহাম্মদী' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ৩০০ টাকার বিনিময়ে। বিভাগ-পরবর্তীকালের মোহাম্মদীর কয়েক বছরের সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন (২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ বর্ষ) মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-৮৪)। প্রচ্ছদে আকরম খাঁর নাম ছাপা হতো না। ৩১ বর্ষ থেকে আবার আকরম খাঁর নাম ছাপা হতে থাকে। তাঁর (আ. খাঁ) মৃত্যুর পর (১৯৬৮) কয়েক সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে বদরুল আনাম খাঁর নাম ছাপা হয়েছিলো। পাকিস্তান-পর্বে, বিভিন্ন সময়ে আবদুল

গাফফার চৌধুরী, আখতার উল আলম, শহীদ আ, ন. ম. গোলাম মোস্তফা প্রমুখ তরুণেরা মোহাম্মদীর সম্পাদনা-সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। মোহাম্মদী পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্যপত্রিকা ছিলো। পাকিস্তান-আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে বিবেচনা করলে 'মোহাম্মদী' ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করবে। এর পাকিস্তানকালীন ভূমিকাও পাকিস্তানবাদীদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। এঁরা বাঙালির স্বাতন্ত্র্য কামনা না-করে টিকে থাকতে চেয়েছিলেন মুসলিম এবং অখণ্ড-পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে। যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে সুগম করে দিয়েছিলো, সেকালে মোহাম্মদী তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। বাঙালির স্বার্থে যেখানে পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার ছিলো—সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তবে বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশেও মোহাম্মদীর সদর্থক ভূমিকাও মূল্যবান বিবেচিত হবে, যদি দেখা যায় এইভাবে যে,— বাঙালির চিন্তাধারাকে তাঁরা জনসমাজে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন; এবং জাতীয় চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি বাঙালি পাঠকেরা জানতে পেরেছিলেন মোহাম্মদীর মারফতেও। তাছাড়া তাঁদের সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ের বক্তব্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও বাঙালির স্বার্থবোধও কখনো কখনো প্রতিফলিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রকাশিত মোহাম্মদীর ২১ বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে (১৯৪৭ সনে) কলকাতা থেকে বলা হয়েছিলো :

"আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে মোছলেম-বাঙলার জ্ঞান-বিশ্বাস, সংস্কার-ঐতিহ্য এবং তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয় একটা গুরুতর রকমের সাংস্কৃতিক অভিযান। সুযোগ ও সুসময় মনে করিয়া মোছলেম সমাজের পঞ্চম-বাহিনীও এই অভিযানের সহায়তা করার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। ২০ বৎসর পূর্বে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রধানত এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য। ... যতটা পারিয়াছি করিয়া আসিয়াছি। ... আজ আবার ডাক আসিয়াছে— মুক্ত ভারতে মুক্ত এছলামকে প্রতিষ্ঠা করার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ ও সম্ভাবনা আজ আমাদিগের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পাকিস্তানের বহু প্রকার ভিত্তি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হওয়ার দরকারও আছে খুবই। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে, এগুলি আনুষঙ্গিক উপকরণ হইলেও, পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি ইহার কোনোটাই নয়। আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতে পাকিস্তানের মূল ভিত্তি হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক। মুছলমানদের মন ও মস্তিষ্কে, এমন একটা পুলক, এমন একটা প্রেরণা এবং এমন একটা ভাবাবেগ

জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহার অপরিহার্য্য নির্দেশে বাংলার মুছলমান আদর্শ সাধনার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইবে—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলিতে মোটামুটিভাবে এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি।"

বস্তুত: পাকিস্তানের ভিত্তি মজবুত করার সাধনায় মোহাম্মদী নিরলসভাবে ১৯৭০ সন পর্যন্ত নিয়মিত পাঠক-সাধারণের খেদমতে নিয়োজিত ছিলো। এতে অসংখ্য লেখক বিচিত্র রচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২. আল-ইসলাহ্ (দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৭ - ৮৫)

সিলেটের মওলবী মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-৮৭) সাতচল্লিশ-এর বিভাগ পূর্ববর্তীকাল থেকেই আল ইসলাহ্ বের করে আসছিলেন মুসলমান সমাজের সার্বিক বিকাশের প্রেরণা থেকে। ২৫ বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম-সংখ্যায় ১৯৫৬ সনে মুহম্মদ নূরউল হক সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন :

"সিলেটের মুসলিম সাহিত্য রসিকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৩৬ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চার ব্যাপক প্রচলন, অজ্ঞাতনামা কবি ও সাহিত্যিকগণের রচিত সাহিত্য-সংকলন, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও মুসলিম সাহিত্যসেবীদের সাহিত্যচর্চার সুযোগ প্রদানই ঐ সংসদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার দিনে সিলেট থেকে প্রকাশিত মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা 'আল-ইসলাহ্'কে সংসদের মুখপত্র করে নেওয়া হয় এবং প্রধানত আলোচনা সভা ও 'আল-ইসলাহ্'র মাধ্যমে সংসদ তার সাধনার পথে এগিয়ে যায়; এদেশের সাহিত্যের এবং সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দারিদ্র্যের নির্মমতার মধ্যেই সংসদকে চালাতে হয়। এবং ১৯৪০ সনে মাত্র ৩৯৭ খানা পুস্তক নিয়ে একটা গ্রন্থাগারও সংসদের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়। সংস্কৃতিসেবীদের অক্লান্ত চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান এমনই সুন্দরভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যায় যে, ১৯৪০-৪১ সনে তা সরকারের কাছ থেকে তাঁর স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সমর্থ হয়। তখনকার আসাম গভর্ণমেন্ট ১৯৪০-৪১ ইং সনের বাজেটে সংসদকে ৫০০ টাকা বার্ষিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৩-৪৪ ইং এই সাহায্য বাড়িয়ে ৭৫০টাকা করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর পূর্বপ্যাক গভর্ণমেন্ট এই সাহায্য বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করেন। ১৯৪৮-৪৯ সনের বাজেটে ঐ সময় তাঁরা আরও ৩০০ টাকা দেন। ১৯৪৯-৫০ থেকে বার্ষিক ১২০০ টাকা সরকারী সাহায্য

পেতে থাকে। এছাড়া ১৯৫০ ইং হতে কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ড থেকে একালীন সাহায্য দেওয়া হয় ৫০০০ টাকা এবং ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গ সরকারের উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।"

আর্থিক কারণেই আল-ইসলাহ্ ১৯৫০ সন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সনে তা আবার পুন:প্রকাশিত হয় ২৫ বর্ষ নাম দিয়ে। ১৯৫০ সনে পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ প্রকাশিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু তা হয়নি। ১৯৩২ সনে প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরে ১৯৫৬ তে ২৫ বর্ষ পূর্ণ হয় বলে তাঁরা ঐতিহ্য দীর্ঘ করার কারণে এই গণনা শুরু করেন। বস্তুত ১৯৫৬ পর্যন্ত যুগ্মভাবে (এবং অনেক সংখ্যার অবয়বও ক্ষীণকায়) অনিয়মিত তালেই প্রকাশিত হয়েছিলো। পত্রিকাটি উর্দু-বাংলার বিতর্কে বাংলার পক্ষ অবলম্বন করে। পরে সরকারী মতের সমর্থন করেছে, না-হয় স্পষ্ট করে কোনো মতামত দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। আল-ইসলাহ্র সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক ১৯৬৩ সনে আইউব খাঁর সরকারের সমাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ 'তঘমা-ই-খিদমত' উপাধি লাভ করেন। BNR ও বাংলা একাডেমীর আর্থিক সাহায্য (সরকারী সাহায্যতো ছিলোই) গ্রহণ করেছে। ফলে স্বাধীন মতামত এতে খুবই কম পাওয়া যাবে। আল-ইসলাহ্ ১৯৭১ সনের পরও দীর্ঘদিন ধারা বজায় রেখেছিলো। এর আঞ্চলিক এবং সাম্প্রদায়িক ভূমিকা নগণ্য নয়। 'আল-ইসলাহ্' মানে সংশোধন।

৩. মাহে-নও (১৯৪৯-৭১)

'মাহে-নও' উর্দু কথা। অর্থ-নতুন মাস বা নতুন কথা (ভাবার্থে)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয় আবদুর রশিদের সম্পাদনায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। পত্রিকায় এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখও লেখা হয়েছিলো। ভোলানাথ বসাক কর্তৃক শ্রীকান্ত প্রেস, ৫ নয়া বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং পাকিস্তান পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে এম, আরশাদ হোসেন কর্তৃক করাচী থেকে প্রকাশিত হতো। কিন্তু পূর্বপাকিস্তান থেকে মুদ্রণ, আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশন, —বেশিদিন এই নিয়ম মানা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রথম বর্ষ ৬ সংখ্যা ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়। ঢাকায় আগমন সম্পর্কে ঐ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৫৬) বলা হয় :

'মাহেনও'-র নিজস্ব দপতর কায়েম হয়েছে। 'মাহেনও' পরিচালনার নতুনতর এনতেজামও করা হয়েছে। 'মাহেনও'-কে সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিকপত্রিকায় পরিণত করা মোনতাজেমগণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। 'মাহেনও'-র ক্রমোন্নতির কোশেশ

আমাদের কাম্য। ফলাফল আল্লাহ্‌র রহমৎ এবং লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণের সাহায্য-সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আমরা কামনা করি সকলের নেক্‌নজর হামদর্দী ও মেহেরবাণী।"

'মাহেনও' এর 'আসল মকসাদ' সম্পর্কে বলা হয় :

'মাহেনও'-র আসল মকসাদ নিয়ে কাহারো মনে খট্‌কা রয়েছে বলে মালুম হয়। সাহিত্যের মাধ্যমে আত্ম-চেতনা ও আত্মপরিচিতির পরিবেশে পাকিস্তানের খেদ্‌মত মাহেনও-র আসল উদ্দেশ্য। পাকিস্তান আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সোবেহ্ উম্মিদে শুরু হয়েছে আমাদের নতুনতর জীবনের জয়-যাত্রা। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সফলতার জন্য দরকার সাহিত্যক্ষেত্রে নতুনতর অনুপেরণার সঞ্চার— নতুনতর পরিবেশ ও পরবেষ্টনীর সৃষ্টি। 'মাহেনও' কোশেশ করছে এবং করবে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বাসেন্দাগণের মধ্যে আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক পরিচিতির সোনালী বন্ধন সৃষ্টি করতে। 'মাহেনও' এস্‌তেকবাল করে সহযোগিতা করবে সকল সাময়িক পত্রিকার সহিত নিজস্ব-নীতির দায়েরাতে। নিজেদের ভাবধারা প্রকাশের জন্য 'মাহেনও' কাহারো উপর কোনও ফরমাশ দিবার অহমিকা রাখে না। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা। কে কেমনভাবে নিজের কথা প্রকাশ করবেন, তা লেখক-লেখিকার নিজস্ব-অধিকার এবং দায়িত্ব। কোন লেখা কার কতটুকু বোধগম্য সে বিচারের দায়িত্ব কেউ নিতে পারে না। অতীতে বাংলা ভাষা নানা মোড় ঘুরেছে। বর্তমানে শুরু হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নতুন যুগ। নতুন যুগের সাথে তাল ঠুকে চলবার কোশেশ করবে 'মাহেনও'। বিষয়টি নেহায়েৎ গুরুত্বপূর্ণ। যথাসময়ে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো নতুনতর আবহাওয়া সম্বন্ধে। আজকে বিসমিল্লাহ মাত্র।" (মাহেনও, ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬, সম্পাদকীয়)

'মাহেনও'-এর ঘোষণায় একে 'সচিত্র মাসিক পত্রিকা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এবং কায়েদে আজমের চিত্রশোভিত হয়ে এর যাত্রারম্ভ হয়। নিয়মাবলিতে জানিয়ে দেয়া হয় ইংরেজি মাসের পয়লা ও প্রতিবাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে এবং এপ্রিল থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বর্ষ গণনা করা হবে। বার্ষিক মূল্য আট আনা। সাইজ সাড়ে নয় ইঞ্চি × সাড়ে সাত ইঞ্চি। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশিদ। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদক

ছিলেন (অবৈতনিক) মীজানুর রহমান। চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৯) থেকে ষোড়শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন কবি আবদুল কাদির। ষোড়শ বর্ষ নবম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭১, ডিসেম্বর ১৯৬৪ থেকে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কবি তালিম হোসেন। 'মাহেনও' এর সঙ্গে আবদুল কাদিরের সময়কালে সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্।

'মাহেনও'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (চৈত্র ১৩৫৫) সম্পাদকীয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি করাচীতে বসে লেখা হয়েছিলো :

"খোদাতায়ালার মেহেরবাণীতে 'মাহেনও' প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করিল। কিছুদিন আগেও এই কথা ভাবিতে পারি নাই যে, করাচীতে বসিয়া একটা বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ... একটা প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিক-পত্রিকার আবশ্যকতা বহুদিন হইতেই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আজ দেড় বৎসর যাবৎ সময় ও কালোপযোগী বই-পুস্তক, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকার অভাব অনেকটা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নবলব্ধ আজাদীর সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে জনসাধারণের সামনে পেশ করিবার উদ্দেশ্য নিয়েই 'মাহেনও' এর জন্ম।"

মাহেনও-এর সম্পাদকীয় থেকে দেশবিভাগের পর সাময়িকপত্রিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় :

"অবিভক্ত বাংলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কয়েকটী নামকরা বাংলা মাসিকপত্রিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশবিভাগের পর ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করায় মাশরেকী পাকিস্তানবাসী সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। তাছাড়া পাকিস্তান এখন আলাদা রাষ্ট্র। হিন্দুস্থানের কলিকাতা নগরী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানী তার নিজের আদর্শের, তাহ্জিবের ও তামাদ্দুনের, কোন কিছুরই, সাক্ষাৎ পায় না। সেইগুলিও রোজ-বরোজ ক্ষীণ কলেবরে পরিণত হইয়া বিলীন হইল। তাই তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইল একখানা মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা। দেখা দিল সমস্যা। তারপর আল্লাহর রহমতে সমস্যার ফয়সালা করিয়াই আজ বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকদের সামনে 'মাহেনও' লইয়া হাজির হইলাম। প্রচার বা

কোন কিছুর মামুলী প্রোপাগাণ্ডা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহজিব ও তমদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রধান সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পুরিপুষ্ট নবীন লেখক-লেখিকা সৃষ্টি করা। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শে আজাদীর রঙ ফলাইয়া অনাগত যুগের সাহিত্যিক জন্ম নিলে আমরা আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এই জন্যেই ইন্তেকবাল জ্ঞার্মাইতেছি প্রবীণ ও নবীন লেখক- লেখিকাদিগকে সমভাবে। তারপর মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দূরত্বের মাপকাঠিতে। আদর্শ ও ভাবরাজ্যে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া আজ আর মনে করা যায় না। তাই একাংশের চিন্তাধারা অপর অংশে পরিবেশন করিতে হইবে। 'মাহেনও' এর মারফতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলকে দেখিবে, বুঝিবে, আর খোদ বাংলা 'মাহেনও' পশ্চিমাঞ্চলের ক্রোড়ে বসিয়া নিজের সত্তা বুঝাইয়া দিবে। কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। আমাদের বাংলা 'মাহেনও'-এ প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি ইংরেজী 'পাকিস্তান' ও উর্দু 'মাহেনও' তে তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থাও হইবে। .... জনগণের সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য ও লেখক-লেখিকাদের সহানুভূতিই আমাদের সম্পদ।"

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবি জসীমউদ্দীন 'পাকিস্তান' ও 'মাহেনও' শীর্ষক দুটি কবিতা লিখেছিলেন।

মাহেনও

"আবার আমরা গড়িব কুতুব ইট, কাঠ দিয়ে নয়,
জীবন দানের কীর্তি যে হেথা অনন্ত অক্ষয়।
গড়িব হাফেজ রুমি খৈয়াম গালিব ও আলোয়াল,
যাদের কীর্তি পাহারায় রবে অনন্ত মহাকাল।

* * * * *

আমাদের এই পাকিস্তানের যারা হবে কাণ্ডারী
বৃশ্চিকজ্বালা ভরা যেন হয় তাহাদের বিভাবরী।

* * * * * *

মোদের কবির কণ্ঠে যেন গো জনগণ রূপ পায়,
তাহাদের তরবারি যেন সেথা খরধারে চমকায়।

* * * * * *

পাকিস্তানের ছায়াতরুতলে সকলে সকল কার।"

মাহেনও এপ্রিল ১৯৪৯ থেকে ১৯৭১ সনের নভেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে লেখেননি এমন বাঙালি লেখক হাতে গোনা সম্ভব হবে না। কবি শামসুর রাহমানও জুলাই-আগষ্ট ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের স্থায়িত্ব কামনা করে জয়গান লিখেছেন কবিতার ভাষা ও ছন্দে। অন্যত্র যাই-ই হোন, এখানে এলে সকলেই পাকিস্তানবাদী লেখক-কবি-সাহিত্যিক-ভাবুক-চিন্তক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। আর এখানে প্রগতিশীল ধারার সকল লেখকই এসে সম্মিলিত হয়েছেন। এর রচনা বৈশিষ্ট্যও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

৪. দিলরুবা (১৯৪৯-৬৪)

ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, মরহুম এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের (১৯১১-'৯৪) তাঁর অকাল প্রয়াত স্ত্রী দিলরুবার নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন দিলরুবারই সম্পদে, সমাজের কল্যাণ কামনায়। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সনের এপ্রিল অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। সম্পাদক-প্রকাশক হিসেবে যখন যাঁর নামই ছাপা হোকনা কেন, এ. এইচ. এম. আবদুল কাদেরই ছিলেন দিলরুবার প্রধান কাণ্ডারী। লাভ-ক্ষতিও তাঁরই বহন করতে হতো। নিউজপ্রিন্টের ভালোপদের কাগজে, আট ভাগের একভাগ সাইজে, ৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দিলরুবার প্রথম বর্ষ 'আবুল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক ২১ বি. কে. রায় লেন, বংশীবাজার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক দি সিটি প্রেস, ১৬/৩ কোর্ট হউস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত' হয়েছিলো। 'পরিচালক-সমিতি'র নামও ঘোষণা করা হয়েছিলো: চেয়ারম্যান— বেগম রওশন আখতার খানম; কোষাধ্যক্ষ— বেগম সাঈদা করিম; সদস্য: বেগম সৈএদা সকিনা ইসলাম খাঁ; বেগম আসিয়া রহমান; মিঃ মজবুল আল হোসায়েন; ফরিদ আহম্মদ; মিঃ আবুল হোসেন চৌধুরী এবং সম্পাদক দিলরুবা। ম্যানেজার ও পরিচালক সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন বেগম রাবেয়া এম. হোসেন; সহ-সেক্রেটারি এ. এন. এম. শামসুদ্দীন। এসিস্টেন্ট ম্যানেজার— সৈয়দ মঞ্জুর আলী; রেজা হোসেন খাঁ প্রমুখ। বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিও নিয়োগ করা হয়। পত্রিকায় তাঁদের নাম-ঠিকানাও ছাপা হতো। দিলরুবার উদ্যোগ-আয়োজন মোটামুটিভাবে শক্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। 'দিলরুবা' ইংরেজী ও উর্দুতেও (মাহেনও-এর মতোই) কিছুদিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), বেগম সুফিয়া কামাল (জন্ম ১৯১১); দৌলতুন্নেছা খাতুন, ফয়েজ আহমদ, মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ, মুহম্মদ যকীয়ুল্লাহ, রাবেয়া চৌধুরী প্রমুখ এর সম্পাদক, সম্পাদনা-সহযোগী বা সদস্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দিলরুবা পোষ্ট-অফিসের মাধ্যমে গ্রাহক ও বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে নিয়মিত পৌঁছুতো।

পাকিস্তান-আমলে দিলরুবা, মোহাম্মদী, সওগাত, মাহেনও প্রভৃতির সঙ্গে সমান মর্যাদায় উচ্চারিত হতো। বেসরকারী পত্রিকাগুলোর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্রিকা সমূহের মধ্যে 'দিলরুবা' নিঃসন্দেহে দীর্ঘতম সময় ধরে প্রকাশিত উচ্চমানসম্পন্ন পত্রিকা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। দিলরুবার নিজস্ব ছাপাখানা এবং একটি প্রকাশনা-সংস্থাও গড়ে উঠেছিলো। রচনাগুলোর বক্তব্য ছিলো উদার-মানবিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল। যদিও তাঁদের মুখ্য আদর্শ ছিলো মাহেনও-মোহাম্মদীর মতোই পাকিস্তানের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু বক্তব্য ও সমালোচনায় সাম্প্রদায়িকতা উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। এঁরা বরং এই বিবেচনায় সওগাতের ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আবার যদি বলা হয় যে সওগাতও পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চরিত্র তেমন ধারণ করেনি, তাহলে সওগাত-কেও মাহেনও-দিলরুবা-মোহাম্মদীর ধারায় ফেলতে হয়। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় সওগাতকে সমকাল-পূর্বমেঘ প্রভৃতির সূতিকাগার বললে, ঐ শ্রেণীতে এর পাকিস্তান আমলের প্রকাশনাগুলোকে না ফেলাই সঙ্গত।

দিলরুবার ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় পাঠকদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা হয় :

> "দিলরুবা কোনও একটি বিশেষ দলের মুখপত্র নহে। কোনও বিশেষ প্রেরণায় 'দিলরুবা'র প্রকাশনা আরম্ভ হইলেও প্রকাশনার সময় পূর্ব পাকিস্তানে কোনও সাহিত্যপত্রিকা না-থাকায় দল নির্বিশেষে সাধারণ সাহিত্যসেবাই ছিল 'দিলরুবা'র আদর্শ এবং অতঃপর অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ পাইলেও দিলরুবা সেই আদর্শ হইতে স্খলিত হয় নাই। লেখা প্রকাশ করা লেখকের নামের উপর নির্ভর করে না বরং লেখার উপর নির্ভর করে। যদি কোন লেখক বা লেখকগোষ্ঠী মনে করেন যে তাঁহার বা তাঁহাদের মতবাদের বিরোধী কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ না থাকিলে সে লেখা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে ... এই রূপ পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রকাশনার ভিতর দিয়াই প্রসার লাভ করিবে সত্যিকার সাহিত্য।" (দিলরুবা, ৪ বর্ষ ৬ সংখ্যা, পৃ ৪৭১)

'সংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয় :

> 'সংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কি ? তামাদ্দুন শব্দটি সংস্কৃতির ঠিক অনুবাদ নহে। যাঁহারা সংস্কৃতি, তামাদ্দুন, রেনেসাঁ, তাহজিব ইত্যাদি শব্দগুলির যথেচ্ছা ব্যবহার করেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অনেকেই শব্দগুলির সূক্ষ্ম অর্থ অনুধাবন করেন নাই। 'তামাদ্দুন' শব্দটির মূল অক্ষর হইল-মিম, দাল এবং নুন— অর্থ নগর এবং সারার্থ

হইল নাগরিকসুলভ চরিত্র গঠন। 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ হইল শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ। 'তাহজিব' শব্দটির মূল অক্ষর হে, জাল এবং বে— অর্থ পরিষ্কার করা, সারার্থ হইল স্বভাব নিষ্কলুষ করা এবং রেনেসাঁ শব্দটির অর্থ লুপ্তবস্তুর পুনরুত্থান। এই কয়টি শব্দের একটি আর একটির প্রতিশব্দ বা পরিভাষা নহে। সুতরাং একটি শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ গ্রহণের অন্যায় প্রচেষ্টা না-করিয়া তাহজিব তামাদ্দুন রেনেসাঁ এসব শব্দগুলিকে বাংলাভাষার শামিল করিয়া পাকিস্তানী বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করাই সমুচিত। আর স্বয়ং তামাদ্দুন মজলিস যখন তাঁহাদের আশু-অধিবেশনে 'ইসলামী সংস্কৃতি' নাম দিয়া 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এমনকি আয়ুর্বেদকে ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে 'নাগরিক সুলভ স্বভাব' গঠনে উদার আদর্শই তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বন্ধুবরের 'সংস্কৃতি'র পরিবর্তে 'তামাদ্দুন' লিখার অনুরোধ অবান্তর। ... শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকগণ রাজনীতির জঘন্য পরিবেশ হইতে দূরে থাকিয়া নীরব সাহিত্যচর্চা করুন। তাঁহাদের নৈতিক মান উন্নত করুন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় দিলরুবা দলনির্বিশেষে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবে।" (পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭২)

পত্রিকার লক্ষ্য-আদর্শ সম্পর্কে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বলা হয় :

"এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দৈন্য দূর করবার চেষ্টা করা। ... বাংলা ভাষায় এ দৈন্যের কৈফিয়ৎ তুলে অনেকেই আজকাল মাদেরী জবান ছেড়ে অন্যভাষার দিকে নজর দিচ্ছেন। এ দৈন্য যে সত্যিই আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেটার কারণ হচ্ছে এতকাল এত অধিকাংশ মুসলিম অশিক্ষিত ছিলেন আর তার ফলে মাতৃভাষার চর্চা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। আজ আমাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক আর সহজ বলে মনে হয় যে, আমরা এ ভাষার পরিপুষ্টি সাধনে তৎপর হব। এতে মুসলিম জাতীয় জীবনের কাহিনীর চিত্রন চাই, ইসলামের দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা চাই, এর কাব্যচর্চার পেছনে নতুন জীবনদর্শন প্রয়োজন। তবেই এ-ভাষা আর দীনহীন থাকবে না— আমাদের জাতীয়ভাবের সত্যকার বাহন হবে।

আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশের চেষ্টা করা। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে চিরকালই একটা ভাবগত বৈষম্য ছিল। আজাদীলাভের পর সেটাই স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর যোগ মাটির সঙ্গে, নদীর সঙ্গে, এদের চালচলতি সবই মুসলমানী কায়দায় গড়ে উঠেছে, কারণ সংখ্যায় মুসলমানেরা অত্যধিক। আমাদের সাহিত্যে এরূপ প্রকাশিত হতে বাধ্য।

তবে আমাদের পত্রিকায় যে, এখনই সেরূপ ধরা দিয়েছে তা বলতে সাহস করিনে, কারণ এখনও আমাদের উপর পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক প্রভাব খুবই প্রবল। এ-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিছু সময় লাগবে। লাগুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু কাটিয়ে ওঠাই দরকার।

আমাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য পত্রিকার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন সমাজসেবার কাজ করা যায় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বেগম দিলরুবা কাদেরের স্মৃতিকে স্মরণ করে। তিনি অল্প বয়সেই কলিকাতার লেডী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; ... তিনি বিদ্যোৎসাহিনী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্না বহুগুণান্বিতা ছিলেন। নারী শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিশেষ কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। তাঁরই সম্পদ ও আদর্শ কেন্দ্র করে তাঁরই আত্মার প্রেরণায় 'দিলরুবা' প্রকাশিত হলো। ... ভবিষ্যতে ... লভ্যাংশ দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন, বিশেষত: নারী-শিক্ষা ও দুঃস্থ মানবতার সেবা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য— তাছাড়া আজ তাঁর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করে পত্রিকা প্রকাশ অর্থহীন।

আমাদের এসব উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভর করে কতকটা আমাদের চেষ্টার ওপর আর কতকটা নবীন লেখক ও পাঠকদের উপর। যাঁরা নয়া-নয়া লিখছেন তাঁদের উচিত পশ্চিম বাংলায় বর্দ্ধিত সাহিত্যকে আদর্শ না-করে নতুন একটা আদর্শ গড়ে তোলা। ঢাকা শহরের ইট, কাঠ, পাট্‌কেলের মধ্যে যেন তাঁদের সাহিত্য সীমাবদ্ধ না-হয়— তাঁরা যেন বিশাল দেশকে চেনেন...

নানা বিভাগে দেশ এখন বহুধা বিচ্ছিন্ন। সবচাইতে বড় বিভেদ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ আর গ্রাম্য চাষী সমাজের মধ্যে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা এ বিভেদ কখনও সৃষ্টি করত না; তার কারণ শিক্ষিতেরা আধুনিক কালের মত বিজাতীয় শিক্ষা লাভ করতেন না, আবার শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্য তাঁদের জ্ঞান অর্জনই ছিল, বর্তমান কালের মত চাকুরী-অন্বেষণ ছিল না। আমরা আজকাল যে শিক্ষালাভ করে থাকি, সে শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির প্রাণের যোগ নেই। আমাদের জাতির মূলভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। তাঁর জন্যই যাঁরা এ শিক্ষালাভ করেন তাঁদের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ লোকের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত : এ শিক্ষা বিজাতীয় শিক্ষা। পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্র ঐ শিক্ষার পশ্চাতে কাজ করছে। ফলে এ শিক্ষার সংস্পর্শে যাঁরাই আসছেন তাঁরাই কিছু না কিছু সেই বস্তুতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেই বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ধর্মের, আমাদের মনোভাবের চিরকালের বিরোধ, তাই সেই বস্তুতন্ত্র আমাদের দেশের অধিকাংশের থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এ ছাড়াও আছে আমাদের চাকুরীর উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করা ... আমাদের এ দূরবস্থা

দূর করতে পারি কি হলে ? প্রথম কথাই হচ্ছে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজকে নিয়ে। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে নূতন ভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করা দরকার। কিন্তু সে পরিকল্পনার পূর্বে চিন্তা করতে হবে আমাদের সমাজের কথা, আমাদের জাতির কথা এবং আমাদের ধর্মের কথা। ... কোরআন শরীফে সেই জীবনাদর্শ প্রচারিত হয়েছে রসূলের জীবনে ও কার্যাবলীতে তার রূপায়ন... কিন্তু এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের কর্মপদ্ধতির যোগসূত্র হারিয়ে গেছে। আমাদের চিন্তা অন্যমুখী। যে চিন্তাশক্তির সাহায্যে ইসলামী সভ্যতার প্রারম্ভে মুসলমানেরা তাঁদের জীবনের সঙ্গে আদর্শের যোগ খুঁজে পেতেন আজ আমাদের মধ্যে সেই চিন্তাশক্তির অভাব ঘটেছে। ... পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে কমিউনিজম ..... সেই কমিউনিজম ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। .... আমাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত পাঠ্যবই-ই পাশ্চাত্য ধরনের হয়ে থাকে। পাকিস্তানে নূতন ইসলামিক স্কুল অব ইকোনমিক্স এর উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং সেপথে গবেষণা চালানোর জন্য নবীন ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।"

দিলরুবা ১৫ বছর ধরে বের হয়েছিলো, কিন্তু শেষের দিকে এর আর তেমন জৌলুস ছিলো না। এর সাহিত্যিক ও সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ছয় দফা আন্দোলন ও পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ে সমাজ-পরিস্থিতিও অনেক পাল্টে যায়। অতএব পুরনো ধারার চিন্তা থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে, আর চীন-সোভিয়েতের পুস্তকের প্রতি কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ফলে দিলরুবার পুরনো, পাকিস্তানবাদী ভাবমূর্তি ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে, সম্পাদক নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন; আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নতুন করে (বিয়ে করে) সংসারী হয়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আইন ব্যবসা ও অন্য জগতে। অতএব পত্রিকার মান পড়ে যায়। অতঃপর ১৯৬৫ সনের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। উর্দু ও ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশের কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

৫. নওবাহার (১৯৪৯-৫৪)

'নওবাহার' এর সম্পাদিকা ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)-র পত্নী মাহফুজা খাতুন। বস্তুতপক্ষে গোলাম মোস্তফাই মূল ব্যক্তি ছিলেন। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। প্রথমে 'সচিত্র মাসিকপত্র' কথাটা উল্লেখ করা হতো। বলা হতো 'পরিচালনায়: কবি গোলাম মোস্তফা'। ভাদ্র মাস হতে বর্ষ শুরু হয়ে আশ্বিনে শেষ হতো। ঘোষণায় বলা হয়েছিলো : 'প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হয়'। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ছয় টাকা বারো

আনা। ঠিকানা: ম্যানেজার, নওবাহার, ৯৫, ইসলামপুর, ঢাকা। মুসলিম বেঙ্গল প্রেস, ৪৬ নং জিন্দাবাহার ফার্স্টলেন হতে এম. আবদুর রশিদ দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯৫, ইসলামপুর থেকে মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত। চৈত্র ১৩৫৬ সন থেকে পত্রিকার মুদ্রক পরিবর্তিত হয়ে যান। তখন থেকে মোহাম্মদ ইসরাইল হোসেন কর্তৃক পত্রিকাটি ছাপানো হতো। প্রকাশক ছিলেন মহীউদ্দীন। তবে দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা থেকে প্রকাশকও পরিবর্তিত হন— মুজিবুল হক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এরও পর কিছু পরিবর্তন হয়। তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যায় মুদ্রক ও প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয় ইসরাইল হোসেন-এর। 'নওবাহার' এর প্রাপ্তব্য শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৬০-এ। এটি ছিল ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> "নওবাহারের প্রকাশ ... আমাদের জীবনে আনে কল্যাণ।... এক হাতে সে ভাঙে, আর এক হাতে গড়ে। এই ভাঙাগড়ার মধ্যেই তো জীবন। নওবাহার আসে তরুণের বেশে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে শক্তিমান। পুরাতনকে সে ভয় করে না। কারো সাথেই তার দ্বন্দ্ব নেই। যে সর্বজয়ী, তার মনে কোন ... কারও প্রতিই বিরাগ থাকে না। পুরাতনকে কেন সে স্বতন্ত্র মনে করবে ? পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সে তাই কোন সীমা-রেখা টানে না। যে তরুণ বৃদ্ধকেও তার যাদুস্পর্শে তরুণ করিয়া না লইতে পারে, সে আবার কিসের তরুণ?"

পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> "নওবাহারের পশ্চাতে আছে একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শের প্রেরণা। আমরা দিতে চাই একটা Cultural Drive, গড়িতে চাই একটা আদর্শ তমুদ্দনিক পাকিস্তান। আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে যদি পাকিস্তান না আসে তবে বৃথাই হইবে এই বাহিরের আয়োজন। .... আমরা চাই এমন একদল কবি-সাহিত্যিককে যাঁরা এই বন্ধুর পথ দিয়া অগ্রসর হইবেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুই-ই আমরা গড়িতে চাই। নওবাহারের ইহাই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে : আমাদের কবি সাহিত্যিকদের একটি অংশ এখনও বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে ঘুরিতেছেন।"

৬. দ্যুতি (১৯৪৯-৫২)

দ্যুতি যে দু-পর্যায়ে বের হয়েছিলো— সেকথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু তমদ্দুন মজলিশের 'আমাদের প্রেস' থেকে ওবায়েদ আসকারের সম্পাদনায় খ্যাতিমান 'দ্যুতি' প্রকাশিত হয় 'নবপর্যায়' কথাটা ধারণ করে। অর্থাৎ এর আগের

পর্যায়ের সঙ্গে এই দ্যুতির সংযোগ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের দ্যুতিতে সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত হয় আরেফ আলীর। প্রকাশক: হামেদ শফিউল ইসলাম। প্রকাশস্থল— ১১৫ সেগুন বাগান, রমনা, ঢাকা। একটি ক্লাবের পক্ষ থেকে বের হয়েছিলো— রয়েল সাইজ, চল্লিশ পৃষ্ঠার সাদা কাগজে দ্যুতির এই প্রথম সংখ্যাটি বের হয় ভাদ্র ১৩৫৬-তে।

নব-পর্যায়ের দ্যুতি বের হয় ১৯, আজিমপুর থেকে। এই ঠিকানা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম-এর। তাঁর এবং তমদ্দুন মজলিশ-এর প্রভাব এই পত্রিকায় ছিলো। এর সঙ্গে সহযোগী সহকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুল খায়ের মোসলেহ উদ্দীন, চৌধুরী লুৎফর রহমান, হাসান ইকবাল প্রমুখ। এই পর্যায়ের দ্যুতির প্রাথমিক ভাষ্য উল্লেখযোগ্য :

> 'দ্যুতি' বের হল— ব্যক্তিমালিকানার ছাপ নিয়ে নয়, নিঃস্বার্থ সাহিত্যিকদের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে। পত্র-পত্রিকার অকাল মৃত্যুর বাজারেও এক দুঃসাহসিক উদ্যমের পেছনে রয়েছে আমাদের দুর্জয় ঈমান। নিঃস্বার্থ সাধনার মৃত্যু নেই। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর মাসিকের অভাব মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'দ্যুতি'র আত্মপ্রকাশ। এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা বিচারের ভার রইল সুধীবৃন্দের ওপর। স্বার্থ নয়, আদর্শই হবে 'দ্যুতি'র একমাত্র অবলম্বন। পূর্ব পাকিস্তানে আদর্শভিত্তিক বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েই দ্যুতির যাত্রা শুরু হল।" (সূত্র : সম্পাদকীয়, দ্যুতি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা নবপর্য্যায়, ফাল্গুন : ১৩৫৮)

৭. তাহজিব (১৯৫০)

'তাহজিব' সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-৮০) কর্তৃক তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হতো। প্রকাশকও তিনিই ছিলেন। অফিসের ঠিকানা: ম্যানেজার, তাহজিব, ১নং আবুল হাসানাৎ রোড, ঢাকা। বড় অক্ষরে 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে নাম ছাপা হতো হাকিম আবদুল জব্বার-এর। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। ছয় সংখ্যা পাওয়া যায়। মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে বলে নিয়মে বলা হয়। বার্ষিক মূল্য ছিলো সডাক ছ'টাকা। ষান্মাসিক তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। রূপায়নে ছিলেন তরুণশিল্পী মাহমুদ আলম বেগ। পত্রিকার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিলো নিম্নরূপ:

> "পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্মুখে আজ যে সংকট সন্ধিক্ষণের সূচনা হয়েছে, তারই ভিতর দিয়ে আজ আমাদের যাত্রা শুরু। আড়াই বছর আগে আমরা জীবনমরণ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অর্জন করেছি আমাদের আবাসভূমির আজাদী। পাকিস্তানের ন্যায়

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ... 'মুসলিম ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিলো মুসলিমলীগের মঞ্চ থেকে প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবালের অভিভাষণে। ১৯৪০ সালে লাহোর লীগ অধিবেশনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করলো আল্লামা ইকবালের কল্পনা। তারপর জিন্নাহ্ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন— পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। নবজাত রাষ্ট্রের সামনে সমস্যা বিভিন্ন। তার সমাধানের জন্য জাতির প্রত্যেকটি নাগরিককে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভিতর ও বাইরে আমাদের রাষ্ট্রের দুশমনদের অন্ত নেই। ... আমাদের আপাতত কর্তব্য হবে ভিতরের দুশমন দমন করা। আমাদের কওমী জিন্দেগীতে দুর্নীতির চাইতে বড় দুশমন আর কিছুই নেই। সেই দুর্নীতি ও পরাজিত মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করার জন্য আমাদের অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। পাকিস্তানের দিকে দিকে এই অভিযান চালাতে হবে অব্যাহত গতিতে। 'তাহজিব' আমাদের জাতীয় জীবনের সব গলদ দূর করে সুষ্ঠুভাবে জাতি গঠনের ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। আমরা এই নয়া অভিযানে দেশবাসী জনগণকে কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, চিন্তানায়ক সকলকে আমন্ত্রণ করছি সহযোগিতার জন্য। আল্লাহ্ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

'তাহজিব' মওদুদী-পন্থী ইসলামী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু এই পত্রিকা ছয় সংখ্যার বেশি বেরুতে পারে নি। এতে অনেক ভালো রচনা ছাপা হতো। পত্রিকাটি প্রচলিত প্রথমশ্রেণীর বাংলামাসিকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিলো।

৮. পূরবী, লেখক সংঘ পত্রিকা ও পরিক্রম (১৯৬০-৭১)

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার ত্রৈমাসিক মুখপত্ররূপে 'পূরবী' মাত্র এক সংখ্যাই বের হয়েছিলো ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। সম্পাদক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ও অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯)। বর্ধমান হাউস ছিলো তাঁদের কার্যালয়। পূরবীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৪২ আর মূল্য ছিলো এক টাকা। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

"রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র হইলেও 'পূরবী' মূলত একখানি সাহিত্য পত্রিকাই হইবে। তবে রাইটার্স গিল্ডের যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮৪) কর্তৃক বর্ধমান হাউস ঢাকা থেকে এ. আর. খান কর্তৃক মুদ্রিত হয়। এক সংখ্যার পরেই এই পত্রিকা 'লেখকসংঘ পত্রিকা' নাম ধারণ করে।

'লেখক সংঘ পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কবি গোলাম মোস্তফা। মুখবন্ধে (সম্পাদকীয়) বলা হয় :

> "পত্রিকা আরো আগেই প্রকাশিত করা উচিত ছিল। কিন্তু নিয়মিত মাসিকরূপে পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আনুষঙ্গিক আয়োজন করতে হয় অনেকখানি। পত্রিকার নামকরণ সম্বন্ধেও মতবিরোধ ছিল, তাই সকল মতের সমন্বয় করিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে, 'লেখক সংঘ পত্রিকা' শেষ সিদ্ধান্তের ফল।"

'লেখক সংঘ পত্রিকা' আশরাফুজ্জামান খান কর্তৃক পাকিস্তান লেখক সংঘ কার্যালয়, বর্ধমান হাউস, থেকে প্রকাশিত হয় এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। দাম: '৭৫ পয়সা। লেখক সংঘ পত্রিকার ১১টি সংখ্যা বের হয়।

'পরিক্রম' দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তে প্রকাশিত হয়। 'পূরবী' ও 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র ১২টি সংখ্যাকে পূরবীর পূর্বতন সংখ্যা হিসেবে গণনা করে 'পরিক্রম' এর প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বেগম সুফিয়া কামাল (১৯৯১...) লেখক সংঘ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরিক্রমের সম্পাদক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬) ও রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪)। লেখক সংঘের প্রভাবশালী সদস্যগণ পরিক্রমের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩১-৮৩); আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-৭৬); আহমদ শরীফ (১৯২১); সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০৩-৮১); আবদুর রশীদ খান, জাহানারা আরজু প্রমুখ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শাহাবুদ্দীন আহমদ, কাজী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, রশীদ হায়দার, আবুল হাসানাৎ, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ এই পত্রিকার 'সহযোগী', 'সহকারী' বা যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আসকার ইবনে শাইখ 'পরিক্রম'-এর প্রকাশক ছিলেন। প্রচ্ছদ আঁকতেন কালাম মাহমুদ, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রউফ, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ। হাসান হাফিজুর রহমান এবং আবদুল গণি হাজারীও 'পরিক্রম'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ছিলেন। লেখক সংঘের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যই 'পরিক্রম' অনুসরণ করেছিলো। তবে বেশকিছু ভালো লেখা ('প্রগতিশীল' ?) ছাপা হয় বলে এটিকে 'মাহেনও' এর মতো কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল একটি সরকারী পত্রিকা বলা চলে না। যুগ-চাহিদা এই পত্রিকার কোনো কোনো লেখায় বক্তব্যে অভিব্যক্ত হয়েছিলো। তাই একটি আধুনিক পত্রিকা হিসেবে 'পরিক্রম' গুরুত্ব লাভ করেছে। একুশে ফেব্রুআরির

শহীদদের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। মুক্তবুদ্ধির সাধক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) এর মৃত্যুর পর শোক-সম্পাদকীয় ও স্মরণসংখ্যা বের করে তাঁরা সাহিত্যিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৭০ সনের শেষ পর্যন্ত পরিক্রম প্রকাশিত হয়েছিলো। দাম ছিলো প্রথম দিকে পঞ্চাশ পয়সা। পরে পঁচাত্তর পয়সা। এবং শেষদিকে এক টাকা। সাদা কাগজে ভালো প্রচ্ছদে এটি প্রকাশিত হতো। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা শতাধিক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রণ সৌকর্য উন্নতমানের ছিলো।

৯ ও ১০ : সংলাপ (১৯৬১-৭০) ও উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭১)

বি এন আর -এর অর্থ সহযোগিতায় ১৯৬১ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১৩৬৮) মাসে কবি আবুল হোসেন (১৯২২) ও ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯২০-১৯৯৫) এর যৌথ-সম্পাদনায় 'সংলাপ' ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম পর্বে মোটামুটি বছর দুয়েক নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯-৭০ এর দিকে সংলাপ আবার বের হয়। তখন ডক্টর ওসমান গণি এর সঙ্গে সংযুক্ত হন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রকাশক ছিলেন। প্রকাশকের ঠিকানা ছিলো ৪২/২ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩। প্রতিসংখ্যার মূল্য ১.২৫ পয়সা। ইডেন প্রেস থেকে ছাপা হতো। বার্ষিক মূল্য ছিলো পাঁচ টাকা। এতে অনেক উন্নত মানের গল্প কবিতা ও সাহিত্য-সমালোচনা প্রকাশিত হতো। সংলাপে কোনো সম্পাদকীয় ছাপা হয়নি। অতএব এর উদ্দেশ্য-আদর্শ বুঝতে হবে কেবলমাত্র রচনার আদর্শ, প্রকাশক-সম্পাদকের চরিত্র ও শ্রেণীগত অবস্থান, আর অর্থ সহযোগিতার ধরন থেকে।

'উত্তর-অন্বেষা'রও কোনো সম্পাদকীয়-কৈফিয়ৎ ছিলো না। এটি সম্পাদনা করতেন প্রফেসর-ডক্টর মযহারুল ইসলাম (১৯২৮—)। সরকারী অর্থ সহযোগিতা নিয়েই উত্তর-অন্বেষা উন্নতমানের কাগজে রুচিসম্পন্ন মুদ্রণ-পারিপাট্যে প্রকাশিত হতো। 'ত্রৈমাসিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যপত্র' কথাটা টাইটেলের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিলো বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। মতিহার, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচ বছরে ২০টির মতো সংখ্যা।

চার

উপসংহার

'বাংলাদেশের সাহিত্য'; 'মুসলিম সংস্কৃতি'; 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা'; আর 'প্রগতিশীল' তথা 'মার্কসীয় ভাবধারার সাহিত্যের' পরিপোষণে পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্রের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উত্তম, মধ্যম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মাঝারিগোছের বাম-ডান—সকল শ্রেণীর লেখকের পৃষ্ঠপোষকতায় একালের পত্রপত্রিকা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। অনুন্নত পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক, অনগ্রসর স্রষ্টা-শিল্পী-লেখকদের লেখার ক্ষেত্র ও অনুশীলনের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিলো নতুন দেশের, নতুন পরিস্থিতিতে প্রকাশিত এই সকল পত্রপত্রিকা। সেকালে আদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও, একালের দূরত্বে,— ধারণাবর্জিত মন নিয়ে দেখলে সেকালের সাহিত্যপত্রিকার গুরুত্ব তাৎপর্য বা অবদানকে উচ্চমূল্য দিতে হয়।

[বিশ্লেষণমূলক বিস্তারিত আলোচনার আয়োজন এটা নয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবল এখানে ঐ কালের পত্র-পত্রিকার পটভূমি ও বিচিত্র প্রবণতার বহুমুখী পরিচয় এবং কয়েকটি পত্রিকার পরিচয় প্রদান করা হলো মাত্র।]

সহায়ক-গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

মুক্তি সংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক ঢাকা। ১৯৭২/১৯৯৫

মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, আনিসুজ্জামান ঢাকা। ১৯৬৯

সাময়িকপত্র ও সমাজগঠন : বাংলাদেশের পরিস্থিতি, ইসরাইল খান ঢাকা। ১৯৮৮

উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২ খণ্ড, ওয়াকিল আহমদ ঢাকা। ১৯৮৩

মুসলিম সাহিত্য সমাজ, সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, খোন্দকার সিরাজুল হক ঢাকা। ১৯৮৪

সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, কলকাতা। ১৩৫৭

বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড, কলকাতা। ১৪০০

ঐ, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা। ১৩৮৪

মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মুহম্মদ এনামুল হক ঢাকা।১৯৬৫

সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঢাকা। ১৯৭৭

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ঢাকা। ১৯৮৭

'আমাদের সাহিত্য', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও সম্পাদিত, (প্রবন্ধ-পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িক পত্র) ঢাকা। ১৯৬৯

বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭-৭১), শামসুল হক ঢাকা। ১৯৭৩

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, সাঈদ-উর রহমান ঢাকা। ১৯৮৩